চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক*

মো. সোহানুজ্জামান*

Abstract: The Permanent Settlement Regulation Act of 1793 was the most significant and revolutionary change made to the Indian land and revenue system under British administration over the Indian subcontinent. Following the implementation of this Act, Indian society experienced significant turmoil. The ancient Indian social structure and customs saw significant transformations and had a wide-ranging impact. It is a well-established fact that writers have always been impacted by significant societal shifts. In that regard, Bibhutibhushan Bandyopadhyay is not an outlier in terms of sociocultural transitions. This research will discuss the impacts and reactions of the permanent settlement system during the British colonial era that are mentioned in the novel *Aranyak.*

সারসংক্ষেপঃ ইংরেজ শাসনামলে ভারতীয় ভূমি ও রাজস্ব-ব্যবস্থায় যে সমস্ত পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তার মধ্যে সবদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা (Bengal Permanent Settlement Regulation, 1793)। এই আইন প্রণয়নের সাথে সাথেই ভারতীয় জনসমাজ বিপুল সামাজিক ভাঙনের সম্মুখীন হয়; পুরোনো ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার প্রভূত পরিমাণ পরিবর্তন সাধিত হয়। যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী, সর্বগ্রাসী। লেখকমাত্রই এই ধরনের বড়ো বড়ো সামাজিক পরিবর্তনের অভিঘাত দ্বারা প্রভাবিত হন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এর ব্যতিক্রম নয়। এই গবেষণা-প্রবন্ধে *আরণ্যক* উপন্যাসে ইংরেজ শাসনামলে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কীভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা আলোচিত হবে।

১.

বাংলা উপন্যাসের বহুধাবিভক্ত ইতিহাস-পাটাতনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১০৫০) নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর উপন্যাস-পাঠের বেলায়, প্রাথমিকভাবে, খুঁজে পাওয়া যাবে কেবলি প্রাণ-প্রকৃতি, মানব-সম্পর্ক, শৈশব-চিত্র, নস্টালজিয়া, আধ্যাত্মিকতাসহ রোমান্টিক সাহিত্য-বৈশিষ্ট্যের নানা অনুষঙ্গ। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের একটু গভীরে প্রবেশ করলেই পাওয়া যাবে সেই গোপন সুড়ঙ্গের খোঁজ, যেখানে প্রচ্ছন্ন আছে রাজনৈতিক অনুষঙ্গের নানা বিষয়। (গোপিকানাথ, ২০১৬ : ১৩) প্রাথমিক পাঠে বিভূতিভূষণের উপন্যাসে এই রাজনৈতিক চৈতন্যের সূত্র-সন্ধান সম্ভব নয়। অন্তর্নিবিষ্ট পাঠ-উন্মোচন পদ্ধতিতেই কেবল সম্ভব এই রাজনৈতিক চৈতন্যের সূত্র-আবিষ্কার। বিশেষভাবে রাজনৈতিক সচেতনতা-সম্পৃক্ততায় যে সমস্ত উপন্যাস বিভূতিভূষণ রচনা করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম *আরণ্যক*। ‘যে কোন

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাসই ঔপন্যাসিকের নিজ সময়-দেশকাল-শ্রেণীর সঙ্গে, নিজের সঙ্গেও একটা বোঝাপড়া।' (পার্থপ্রতিম, ১৯৯১ : ১৩১) বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* উপন্যাস এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে সক্রিয় থেকেছে ঔপনিবেশিক রাজনীতির নানা বিষয়; এবং একইসাথে সেসবের বিরোধিতা-প্রকল্পের উপস্থিতি। এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবিধান। উপরিউক্ত আলোচনার পরও এই বিষয়ে কিছুটা ধোঁয়াসা রয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যে, আধুনিক উপন্যাস-পাঠের বেলায়, 'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ে'র [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়] মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ভিন্নভাবে পাঠ করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। কারণ 'বাস্তববাদী' ও 'প্রকৃতিবাদী' সাহিত্য আন্দোলনের সময়, যখন বাংলা সাহিত্যাঙ্গন *কল্লোল* এবং *কল্লোল*-সমগোত্রীয় পত্রিকার প্রভাবে প্রভাবিত, তখনো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখে যাচ্ছেন ঠিক তাঁর নিজের মতো করে। কেবল *কল্লোলের* আন্দোলন বলে নয়, তেমন কোনো সাহিত্য-আন্দোলনেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেননি; সেইভাবে প্রভাবিতও হননি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য রোমান্টিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও নস্টালজিয়ার সাথে একত্র করে পাঠ করা সম্ভব হয়। প্রাথমিক পাঠ-প্রক্রিয়া এবং অন্তর্নিবিষ্ট পাঠ-প্রক্রিয়ার পার্থক্য তাঁর উপন্যাস-পাঠের জন্য জরুরি বিষয়।

পূর্বে বলা হয়েছে, বিভূতিভূষণ *কল্লোলের* যুগে তাঁর নিজের মতো করে সাহিত্যে রাজনৈতিক আখ্যান-নির্মাণ-প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি নিজের মতো করে তৈরি করেছেন তাঁর সাহিত্যের রাজনৈতিক বয়ান, বাস্তবতা। কিন্তু এর অপর প্রান্তে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেদের মতো করে হলেও মূলত পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আদর্শের সাহায্যে নির্মাণ করেছেন তাঁদের সাহিত্যে প্রকাশিত রাজনৈতিক বাস্তবতা। আর তাঁদের সাহিত্যের রাজনৈতিক প্রতিরোধ-প্রকল্পের খসড়াও ঔপনিবেশিক ছাঁচের সাথেই সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, প্রায় প্রত্যেক 'আধুনিক' লেখকই, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালে, রাজনৈতিক প্রতিরোধ-প্রকল্পের যে সাহিত্যিক ভিত তৈরি করেছেন, তা ছিল মূলত ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক-প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। যা আমদানি করা হয়েছে মূলত ঔপনিবেশিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তা-ব্যক্তিদের পিতৃভূমি থেকেই। বিভূতিভূষণ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিভূতিভূষণ এই পুরো প্রক্রিয়া থেকে বের হতে পেরেছেন। অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিনি বাদ দেননি; তবে তা থেকে তিনি প্রয়োজনের বাইরে গ্রহণ করেননি। গ্রহণ করলেও গ্রহণ করছেন তিনি নিজের মতো করে; এবং তার প্রকাশও অন্তঃসলিলা-প্রক্রিয়ার মধ্যেই প্রবাহিত হয়েছে। যার উদাহরণ স্পষ্ট হবে *আরণ্যক* উপন্যাস-পাঠে।

২.১

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ গড়ে তোলার পেছনে সবচেয়ে কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল এই আইন। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে, কার্যত অর্থনৈতিক স্বার্থে আগত ইংরেজরা শেষ অবধি প্রায় দুইশ বছর ভারত শাসন করে। এই শাসনকালে কোম্পানির শাসন আর রানির শাসন ছিল প্রায় আধাআধি। কোম্পানি আমলে ইংরেজদের সমগ্র কর্মকাণ্ড সক্রিয় ছিল আর্থ-উৎপাদন আর লাভ-ক্ষতির হিসাবের মধ্যে। আর্থ-উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ায়, কোম্পানি আমলের মতো রানির শাসনামলেও এই বিষয়ের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। ভারত জয়ের সূচনায়ই ভারতবর্ষের পুরোনো ভূমি ও রাজস্ব-ব্যবস্থার মাধ্যমে কোম্পানির এই স্বার্থ সম্পন্ন করার ব্যাপারটি ততোটা সম্ভব হচ্ছিল না, যতোটা সম্ভব হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের পরবর্তী সময়ে। এই আইনের মাধ্যমেই প্রায় পুরোপুরি সরকারি রাজস্ব নিশ্চিতকরণ সম্ভব হয়। (সিরাজুল, ২০১৭ : ১৪৯) প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভূমিব্যবস্থা ছিল একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় আবদ্ধ, যা ছিল স্থির ভূমি-আইন কাঠামোয় আবদ্ধ নিশ্চলতার প্রতীক। এর পশ্চাতে সমাজ-ব্যবস্থারও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। অর্থাৎ 'প্রাক-ব্রিটিশ আমলে

বিদ্যমান ভূমি সম্পর্কের ক্ষেত্রে গ্রামই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।' (নাজমুল, ২০১২ : ২) সেই ব্যবস্থায় জমিদার বলতে মূলত খাজনা আদায়কারী শ্রেণিকেই বোঝাতো। যাদেরকে কেন্দ্রের শাসকরা নিয়োগ দিতেন। যারা নির্দিষ্ট অঞ্চলের রাজস্ব-সংগ্রাহক হিসেবে কর্মরত থাকতেন। (Madan, 1964 : 12) কিন্তু এই ব্যবস্থায় জমিদারদের উদাসীনতা পরিলক্ষিত হতো। এই উদাসীনতার প্রকাশ পেত রাজস্ব আদায়ের তারতম্যে; সময় ও পরিমাণে। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র ও কেন্দ্রের শাসকরা কখনই ততোটা সংবেদনশীল হয়নি। কিন্তু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ইংরেজ আমলে।

২.২

আর্থ-উৎপাদন সুনিশ্চিত করার জন্য ১৭৫৭ সালের পর থেকেই ইংরেজরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধের পরপরই ইংরেজরা বোঝার চেষ্টা করছিল ভারতের ভূমি-ব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে। ব্যাপারটি তারা তাদের প্রশাসনিক নীতিনির্ধারণের প্রক্রিয়ার মধ্যেও রেখেছিল। নিরবচ্ছিন্ন রাজস্ব আদায় যেমন সম্পৃক্ত ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাথে, তেমনি করে শাসন-ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল কেবল নিজেদেরই স্বার্থে। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে রাজস্ব আদায় নিয়ে যে সমস্ত কৃষক-বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল, সেই বিদ্রোহ যে ইংরেজ এককভাবে দমনে ব্যর্থ হবে তা সহজেই তারা অনুমান করতে সমর্থ হয়েছিল। এছাড়া নতুন একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষা সম্পৃক্ত ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাথে। ইংরেজদের নতুন এই শ্রেণির সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় জনসমাজের জন্য নয়, তা ছিল একান্তই উপনিবেশের দরকারে।

এই বিষয়টি আরো একভাবে সুবিধাজনক হয়ে উঠলো ইংরেজদের জন্য। তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরির যে প্রকল্প গ্রহণ করেছিল, সেই প্রকল্পের মধ্যে সেই শ্রেণিই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লো, যাদের সাথে পূর্ব থেকেই ইংরেজদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। কারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামন্ত শাসন-প্রক্রিয়ায় জমিদাররা যেভাবে রাজস্ব জমা দিত সেই বিষয়টা সম্পূর্ণ বদলে গেল। এরই ফলে রাতারাতি সামন্ত সমাজ-সম্পৃক্ত জমিদাররা তাদের জমিদারি হারিয়ে নিঃস্ব হলো। অপরদিকে সূর্যাস্ত আইনের কঠোরতায় যখন গ্রামের জমিদাররা তাদের জমিদারি হারাচ্ছিল তখন সেই জমিদারি কিনে নিচ্ছিল নগর কলকাতার নবোদ্ভিন্ন মুৎসুদ্দি শ্রেণিরা। যাদের সাথে কৃষি ও কৃষকের সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারা মূলত কলকাতায় থেকে জমিদারি পরিচালনা করত, তাদের সহযোগী শ্রেণিকে কাজে লাগিয়ে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুনাফা। (বিনয়, ২০১৭ : ৯২-৯৩)

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র, ভূমি-ব্যবস্থা এবং ভূমি-নির্ভর রাজস্ব-ব্যবস্থার সাথে তুলনায় ইউরোপ, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সামন্ততন্ত্র, ভূমি-ব্যবস্থা এবং রাজস্ব-ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এই কারণে ১৭৫৭-এর পর থেকে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগ পর্যন্ত নানা উপায়ে কর-সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েও সফল হতে পারেনি ইংরেজ প্রশাসন। বরঞ্চ সামন্ত ভারতের সাথে পুঁজিবাদী ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ী শাসক-শ্রেণি নতুন নতুন রাজস্ব-ব্যবস্থা চালু করলেও তা হয়েছে হিতে বিপরীত। এমনকি এইসব ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সমস্যা আরো বেড়েছিল। কৃষক ও প্রজা শ্রেণি এই নতুন নতুন রাজস্ব আইনের বিরোধিতা শুরু করে এবং এই বিষয়কে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতেই কৃষক ও প্রজা বিদ্রোহ শুরু হয়। ফলে সেই ব্যবস্থা সামাল দেওয়া এবং নতুন শ্রেণির উদ্ভবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল ইংরেজ সরকার।

ভূমিব্যবস্থার সাথে যাদেরকে সংযুক্ত করার মনোবাসনা ইংরেজ সরকার করেছিল সেই মনোবাসনা সত্যি সত্যিই পূরণ হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে। সূর্যাস্ত আইনের বদৌলতে ত্বরান্বিত হয়েছিল প্রক্রিয়াটি। কারণ পুরোনো সময়ের জমিদারদের কর আদায় প্রক্রিয়ার সাথে একেবারেই সাংঘর্ষিক ছিল চিরস্তায়ী বন্দোবস্ত প্রথা। বিষয়টি যেমন ছিল ইংরেজের কাঙ্ক্ষিত, তেমনি তা সুফল বয়ে এনেছিল

তাদের জন্য। 'কার্যতঃ ঊনবিংশ শতাব্দী হলো সামন্তসমাজের বিলুপ্তি ও ধনবাদী সমাজের পূর্বরূপ বণিকশ্রেণীর উদ্ভবের কাল।' (আকরম, ১৩৯৪ : ৩১৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *যোগাযোগ* উপন্যাসের মধুসূদন চরিত্রের সাথে তুলনায় বিপ্রদাস চরিত্রের সামাজিক অবস্থান-চিত্র এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে বলছেন :

> নুরনগরের চাটুজ্যেদের অবস্থা এখন ভালো নয়। ঐশ্বর্যের বাঁধ ভাঙছে। ছয়-আনি শরিকরা বিষয় ভাগ করে বেরিয়ে গেল, এখন তারা বাইরে থেকে লাঠি হাতে দশ-আনির সীমানা খাবলে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া রাধাকান্ত জীউর সেবায়তি অধিকারে দশে-ছয়ে যতই সূক্ষ্মভাবে ভাগ করবার চেষ্টা চলছে, ততই তার শস্য-অংশ স্থূলভাবে উকিলমোক্তাদের আঙিনায় নয়-ছয় হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, আমলারাও বঞ্চিত হল না। নুরনগরের সে প্রতাপ নেই–আয় নেই, ব্যয় বেড়েছে চতুর্গুণ। শতকরা ন-টাকা হারে সুদের ন-পাওআলা মাকড়সা জমিদারির চার দিকে জাল জড়িয়ে চলেছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৩ : ১১-১২)

এই আইনের মাধ্যমে কেবল যে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনই মুখ্য বিষয় ছিল না, তা লর্ড কর্নওয়ালিসের উক্তিতে স্পষ্ট হয়েছে। এ সম্পর্কে কর্নওয়ালিস বলেন :

> আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই (এদেশের) ভূস্বামিগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে। যে ভূস্বামী একটি লাভজনক ভূসম্পত্তির নিশ্চিন্ত মনে ও সুখে-শান্তিতে ভোগ করিতে পারে, তাহার মনে তাহার কোনরূপ পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগিতেই পারে না। (উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন, ১৪ : ২০১৯)

কর্নওয়ালিসের চিন্তা পরবর্তী সময়ে বাস্তবতা পেয়েছিল। ব্রিটিশরা যে দীর্ঘদিন ভারত শাসন ও শোষণ করতে পেরেছিল, তা সম্ভব হয়েছিল এই আইনের দ্বারাই। এবং যে সহযোগী শ্রেণি সৃষ্টি করতে ব্রিটিশ সমর্থ হয়েছিল সেই শ্রেণিরাই প্রতিনিধি হয়ে জমিদারি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনে। এবং শেষপর্যন্ত তা ঠিকঠাক করেই আবার উপ-কেন্দ্র কলকাতায় ফিরে যায়। এবং এই কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে নবোদ্ভিন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আগাগোড়া আনুগত্যের মধ্যেই থাকতে দেখা গেছে। আবার রাজস্ব আদায়ের একটা সুনিশ্চিত ব্যবস্থাও এই শৃঙ্খলার মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। যা যে-কোনো পরিস্থিতিতেই কাঙ্ক্ষিত কর আদায়ে সহায়ক ও নিশ্চিতকরণে ভূমিকা পালন করেছে।

২.৩

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভারতের আর্থ-সামজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে খুব দ্রুত। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষাসহ প্রায় সবই বদলে গেছে সময়ের সাথে সাথে। এবং এই প্রভাব যে আঠারো শতকেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, ব্যাপারটি তেমন নয়। বরঞ্চ আঠারো শতকের একেবারেই শেষে যে আইন ইংরেজরা প্রবর্তন করেছিল, তা ছিল মূলত পরিবর্তনের সূচনা। যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এবং এই বিষয় দ্বারা, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিষয়টি এই প্রক্রিয়ায় প্রবিষ্ট করাতে সমর্থ হয়েছিল। ঔপনিবেশিক আর্থ-উৎপাদন কাঠামোয় গড়ে ওঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটলো, যাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার তুলনায় একেবারেই নগণ্য, তারাও ইংরেজের সহায়ক শক্তি হিসেবেই সক্রিয় থাকলো।

এই একই প্রক্রিয়ায় পুরো ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই আইন। যার প্রভাবে দেশীয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-নৈসর্গিক পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল; এবং সেই স্থান দখল করেছিল 'নতুন বিষয়'। *আরণ্যক* উপন্যাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে ভারতীয় জনসমাজের পরিবর্তনের রূপটি যেমন বিধৃত হয়েছে,

তেমনি ভারতীয় জনসমাজের আদি প্যারডাইমও উল্লেখিত হয়েছে একইসাথে। আর এই প্রক্রিয়ার প্রতিরোধ-প্রকল্প অন্য কোনো দেশে প্রচলিত 'প্যারাডাইমের' সাথে সম্পৃক্ত না থেকে দেশীয় বিষয়-আশয়ের সাথে একত্র হয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

৩.১

আরণ্যক উপন্যাসের আর্থ-উৎপাদন এবং বণ্টন-প্রক্রিয়া নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে সত্যচরণ কর্তৃক 'ভূমি বন্দোবস্ত' নেওয়ার পূর্বে যে ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 'জঙ্গলমহলে' বিদ্যমান ছিল, তা প্রাক্-পলাশি ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই পরিপূরক। প্রাক্-পলাশি সময়ের ভারতের এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় লগ্নি পুঁজির বাড়ন্ত রূপটা দেখা যায় না। নিজস্ব গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থার ভেতরে সামন্ত শাসনের সাথে সংযোগ রেখে অগ্রসরমান ছিল এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সক্রিয় ছিল। *আরণ্যক* উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে সেই দৈশিক আর্থ-উৎপাদন কাঠামোয় নির্মিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। যদিও সেই পরিস্থিতির ভাঙন প্রতিফলিত হয়েছে এই উপন্যাসের শেষে।

তাহলে এই ভাঙন কেন ঘটলো? বিষয়টি কি শিল্পায়ন-সম্পৃক্ত? প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে কি কোনো ধরনের শিল্পায়নই ঘটেনি? ব্যাপারটি তেমন নয়। এমনকি শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও, '...ভারতীয় প্রযুক্তি কোনোভাবেই নিশ্চল ছিল না।' (ইরফান, ২০১৭ : ১২২) শিল্পায়নের বেলায়ও এই বিষয়টি সমানভাবে প্রযোজ্য। নিজ অঞ্চলে দ্রব্যের উৎপাদন বণ্টন, এবং তা অন্যত্র আমদানি-রপ্তানির বিষয় একেবারেই নিজস্ব ভূমি ও জনগণের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অনেকগুলো সূচকের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ফলে ইউরোপের অর্থনৈতিক মানদণ্ডে ভারতীয় অর্থনীতি পরিমাপের বিষয়টি একেবারেই অমূলক। কারণ, ভারতীয় আদি আর্থ-উৎপাদনের যে ধারাবাহিকতা, তার সাথে ইউরোপের আর্থ-উৎপাদন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার হিসাব একেবারেই ভিন্ন।

এরই জন্য নিজস্ব প্রয়োজনে, যতোটুকু দরকার হয়েছে, ততটুকুই উৎপাদন ও বাণিজ্য-কার্য সম্পাদিত হয়েছে ভারতে। এর মানে এই নয় যে ভারতে 'আধুনিক অর্থনীতির' বিষয়টি একেবারেই ছিল না। 'সত্যিই আশ্চর্যের কথা তা হল, ক্রান্তীয় অঞ্চলের দরিদ্র কৃষিপ্রধান দেশগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতেই আধুনিক অর্থনীতির একটা কাঠামো গড়ে উঠেছিল।' (তীর্থংকর, ২০১৭ : ১৫৮) ফলে *আরণ্যকে* বিধৃত যে দরিদ্র ও দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে, তা কেবলই ইউরোপের সাথে দ্বৈত তুলনায় সত্য বলে প্রতীয়মান হলেও ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। এই প্রক্রিয়ায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থা এবং সামন্তনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেওয়া সমীচীন নয়। যদি ভারতে ব্রিটিশ অর্থনীতিকে মেনে নেওয়া হয়, তবুও এই মত মেনে নিতে হবে যে, সমগ্র ভারত এই অর্থনীতির সুফল ভোগ করেনি। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি এবং নির্দিষ্ট অঞ্চল এই অর্থনীতির সুফল ভোগ করেছে। বরঞ্চ পুঁজির কুফল ভোগ করতে হয়েছে ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে।

সত্যচরণ উপরিউক্ত কলকাতাকেন্দ্রিক জমিদারদের সহায়ক হিসাবে এসে কেবলই যে বন ধ্বংস করেছে, ব্যাপারটা তেমন নয়; একই সাথে বহুদিন যে ভূমিতে সাধারণ মানুষ কৃষি ও অন্যান্য কৃষি-নির্ভর কাজ করে জীবনযাপন করছিল তারাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নিজস্ব ভূমি থেকে উৎখাত হতে বাধ্য হয়েছে। ভূমি থেকে উৎখাত হওয়ার পরবর্তী সময়ে যদি এই কৃষকরা অন্য কোনো কাজ পেত, তবে হয়তো-বা অবস্থা হতো ভিন্ন। কিন্তু তা হয়নি। বরঞ্চ নির্দিষ্ট জমিদারি অঞ্চলে ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থা হয়েছিল একেবারেই শোচনীয়। এরই ফলাফল হিসাবে *আরণ্যক* উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে ভূমিহীন কৃষকদের বস্তি স্থাপন প্রক্রিয়া, এবং কৃষকদের মৌসুমি শ্রমিক হয়ে যাওয়ার বিষয়টি। এই বিষয়ে বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে বলছেন, 'যে-সব লোক এইসব বস্তিতে বাস করে, তাহাদের জীবনও আমার

কাছে এই কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির মতো রহস্যাবৃত।' (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ১২৩) পূর্বে এই গৃহহীন, ভূমিহীন মানুষদের সম্পর্কে বলছেন :

> কোথা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে তাই ভাবি; ভদ্রাসন নাই, পৈতৃক ভিটা নাই, গ্রামের মায়া নাই, প্রতিবেশীর স্নেহমমতা নাই–আজ ইসমাইলপুরের বনে, কাল মুঙ্গেরের দিয়ারা চরে, পরশু জয়ন্তী পাহাড়ের নিচে তরাইভূমিতে–সর্বত্রই ইহাদের, সর্বত্রই ইহাদের ঘর। (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ১২৩)

এ ভিন্ন আর কোনো গতি তাদের আদতে ছিল না। কারণ ভূমি হারিয়ে তারা না পারছিল পূর্বের কাজে ফিরতে, আবার না পারছিল নগর কলকাতায় গিয়ে কারখানায় চাকরি করতে। এরও রয়েছে নানা কার্য-কারণ সূত্র । 'এর আসল কারণ বাঙলাদেশে এবং সারা ভারতে ইংরেজ রাজত্বকালে শিল্পোন্নয়নের অভাব।' (বদরুদ্দীন, ২০১৯ : ২৮) ফলে ভারতের 'আধুনিক' অর্থনীতির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা জরুরি হয়ে পড়ে। ভেবে দেখার দরকার হয় যে, এই 'আধুনিক' অর্থনীতি কতোটা উপকারে লেগেছে ভারতীয় জনগণের জন্য। অপরদিকে ভারতে এই অর্থনীতির বিপরীতে স্বার্থহীন মহাজনি কারবারে নিয়োজিত ধাওতাল সাহু। এক কথায় পুঁজির বিকারের প্রতিরোধ-প্রকল্প হিসাবেই ধাওতাল সাহু চরিত্রটি কাজ করেছে। একইসাথে প্রাক-পলাশী যুদ্ধ যুগে ভারতের পুঁজির স্বরূপও এই ধাওতাল সাহুর আর্থিক কর্মকাণ্ডে স্পষ্ট হয়েছে। আবার এর মাধ্যমে নতুন ও পুরোনো জমিদারশ্রেণির চরিত্রও হয়েছে স্পষ্ট। স্পষ্ট হয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বরূপও।

৩.২

উপনিবেশের সমস্ত কলকব্জা সচল রাখার জন্য শিক্ষা জরুরি বিষয়। নয়া-উপনিবেশবাদী-চিন্তায়ও এর তেমন পার্থক্য ঘটে না। ঘটেনি কারণ উপনিবেশবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থারই তো কোনো পরিবর্তন হয়নি আজ পর্যন্ত। উপনিবেশ-উত্তর ভারতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। উপনিবেশের দরকারি বিভিন্ন অনুষঙ্গের মতো শিক্ষা এক বিশেষ অনুষঙ্গ। যেমন হাত—তা দিয়ে খাওয়া যেতে পারে খাবার। কিন্তু শিক্ষা তো কেবলই এই 'কেজো' ব্যাপারকেই সমর্থন করবে, সবক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন নয়। শিক্ষার রয়েছে বহুসূত্র-সম্পর্কিত কার্যকারিতা। যে বিষয় দ্বারা চিন্তার একমুখীকরণের বিষয় রোধ করে চিন্তাকে বহুমুখী করে তোলা হয়। এই বহুমুখী চিন্তা-সম্পৃক্ত শিক্ষার পরিস্থিতি কেমন ছিল উপনিবেশিত ভারতে—তা একটু গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করলেই স্পষ্ট হয়।

ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে ক্ষমতা-কাঠামো, প্রশাসন-কাঠামো, অর্থনৈতিক-কাঠামো এবং শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক জগতের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রেও সম্পাদিত হয়েছিল এক ভয়াবহ উপনিবেশায়ন। এমন এক পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সেই সময় জারি রেখেছিল ইংরেজ—ভারতে—যার ফলাফল আজও ভোগ করতে হচ্ছে এই ভূমির জনগণকে। আলোকায়ন-প্রভাবিত ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, যা পরিচিত 'ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রকল্প' হিসেবে, শিক্ষা এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যকে বাতিল করে দিয়েছে; এবং একইসাথে যা ভারতীয় শিক্ষা-আদর্শের পরিপন্থিও বটে। এই শিক্ষা-প্রকল্প যে ঔপনিবেশিক মোড়কে আবদ্ধ ছিল, তা স্পষ্ট হবে মেকলের চিন্তা পাঠ করলে। কারণ মেকলে ভারতে শিক্ষাকে 'শিক্ষা' হিসেবে গ্রহণ না করে কেরানি তৈরির 'যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান' হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। এই বিষয়ে মেকলে এটাও বলেন যে, 'আমি কখনই তাঁদের মধ্যে [সেইসব ইংরেজ, যাঁরা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজির পরিবর্তে ভারতীয় ভাষার পক্ষে ওকালতি করছেন] এমন একজনকেও পাইনি, যিনি অস্বীকার করতে পারবেন যে একটা ভালো ইউরোপীয় লাইব্রেরির একটামাত্র শেলফ পুরো ভারতের নেটিভ ও আরবীয় সাহিত্যের সমতুল্য।' (Macaulay, 1835) ২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ সালে 'মিনিট অন ইন্ডিয়ান এডুকেশন' (*Minutes on Indian Education*) প্রবন্ধে মেকলের বক্তব্য একইসাথে বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও বর্ণবাদী চিন্তাকেই সমর্থন করে।

উপরিউক্ত শিক্ষা-চিন্তাই *আরণ্যক* উপন্যাসের সত্যচরণ চরিত্রে স্পষ্ট হয়েছে। চরিত্রটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় আলোকায়নের ভূমিকাকেও সরব করে তোলে, ব্যবহার করে নিজের দরকারে। একইসাথে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যে একটি 'কর্ম খুঁজে ফেরার উদ্দেশ্য' ব্যতীত ভিন্ন কিছু নয়, তা-ও *আরণ্যক* উপন্যাসের সত্যচরণের দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট হয়। এই ধারাবাহিকতায় সত্যচরণের কাছে জঙ্গলমহলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা পরিচালিত প্রচলিত ভারতীয় টোলের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অকেজো ঠেকেছে; নিজের শিক্ষা-অর্জন প্রক্রিয়ার সাথে বেমানান মনে করেছে। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার মূলে যে আশ্রম-ভিত্তিক শিক্ষাই দীর্ঘদিন সক্রিয় ছিল, সেই বিষয় সত্যচরণের দ্বারা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে কোনো ধরনের স্বার্থচিন্তা ছিল না; কিংবা ছিল না কেবল 'কর্ম করে বেঁচে থাকার' বিষয়ও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ* নামক পুস্তিকায় ভারতীয় শিক্ষার মূল প্রবণতাটা ধরার চেষ্টা করেছিলেন। এবং ভারতীয় তপোবনভিত্তিক শিক্ষা-ভাবনার বিষয়ে বলেছিলেন, 'আশ্রমের শিক্ষাকে যথার্থভাবে সফল করতে হলে জীবনযাত্রাকে যথাসম্ভব উপকরণবিরল করে তোলা অত্যাবশক হয়ে ওঠে।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৮ : ১২-১৩)

প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন গড়নে নির্মিত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী পর্যায়ে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতে গড়ে উঠেছিল, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল নিছকই কেরানি তৈরির উদ্দেশ্যের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু ভারতের নিজস্ব শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং এই শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শে নির্মিত। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত নানারকম বিদ্রোহ ভারতে সংঘটিত হয়েছিল ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিপাহী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ব্রিটিশদের ভাবনায় ফেলেছিল। যদিও এই সমস্যারও সমাধান করতে সমর্থ হয়েছিল ব্রিটিশ, ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এমন একটি শিক্ষা-পদ্ধতি চালু করেছিল উপনিবেশ-সরকার, যে তা আমাদের অঞ্চলের স্বতন্ত্র, স্বাভাবিক এবং নিজস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে। যার পক্ষে ন্যাটিভ বুদ্ধিজীবীরা সেই সময় তাবেদারি যেমন করেছেন, তেমনি একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির বুদ্ধিজীবীরা আবার নানানভাবে বিরোধিতাও করেছেন। তাই এই প্রবণতার জন্য ভারতীয় ভূমিতে বসবাসকারী জনগণকে এককভাবে দায়ী করা সম্ভব নয়।

কিন্তু সজীব শিক্ষা ও শিক্ষার যে একটি ভারতীয় দার্শনিক প্রবণতা ছিল সেই ব্যাপারে *আরণ্যক* উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের আগ্রহ চোখে পড়ে। এই উপন্যাসের চরিত্রসমূহের মাধ্যমেই এই বিষয় উপস্থাপন করেছেন বিভূতিভূষণ। দুই ধারায় শিক্ষিত–সত্যচরণ এবং যুগলপ্রসাদ–এদের মধ্যে তুলনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সত্যচরণ ঔপনিবেশিক 'আধুনিক' শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের কর্মের খোঁজে বনাঞ্চল ধ্বংস করে জনপদ গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত হয়েছে। অপরদিকে যুগলপ্রসাদ কোনো কর্মের ব্যাপারে, স্বার্থের ব্যাপারে আগ্রহী না হয়ে বনে বীজ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, যাতে বনভূমি ও তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ৬৫) ফলে মানস-জগৎ নির্মাণের বেলায় যুগলপ্রসাদ এবং সত্যচরণের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য নির্মিত হয়েছে। কিন্তু একই সময়ে, একই ভূমিতে একই শাসনকাঠামোয় বেড়ে ওঠা দুইজন মানুষ কেন দুইধরনের চিন্তায় নিজেদের নির্মাণ করলো? এই প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি।

সত্যচরণের মন মূলত 'মেট্রোপলিটন মন'। এই 'মেট্রোপলিটন মন' একদিনে তৈরি হয়নি। এর পেছনে কাজ করেছে নানা বিষয়। 'চার্নকের দেশী ও বিদেশী উত্তরাধিকারীরা সমস্ত কলকাতা মহানগরকে ধীরে ধীরে এক বিশাল বাণিজ্যকুঠিতে পরিণত করেছেন এবং মহানগরের মানুষগুলোকে তৈরি করেছেন বাণিজ্যের বেচাকেনার পণ্যরূপে।' (বিনয়, ২০১৬ : ৯) আর এই প্রভাবেই সত্যচরণের মতো যুবকদের মানস-জগতের সৃষ্টি। যারা সহায়ক শক্তি ছিল ইংরেজদের। আর এই সবের পেছনে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা। এই ব্যবস্থাটাকেই এগিয়ে নিয়ে, ভারতে ইংরেজ প্রশাসনকে দাঁড় করানোর জন্যই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলে 'কেজো শিক্ষার' ব্যাপারে লোকজনকে আগ্রহী করে তোলা হয়।

এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্থান যে সবাই করতে পেরেছে তা ঠিকঠাক বলা যাবে না। মুৎসুদ্দি শ্রেণির সন্তানরাই এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছিল। প্রথমদিকে মুসলমানরা যে এই শিক্ষা গ্রহণে অপারগ হয়েছিল এর পেছনে কেবলই তাদের জাত্যভিমান কাজ করেছিল, বিষয়টি পুরোপুরি ঠিক নয়। আর্থিক সংগতি না থাকার ফলেই এই শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হয়নি মুসলমানরা। কারণ পুরোনো সামন্ত শাসনব্যবস্থায় মুসলিমদের যে অবস্থান ছিল সেই অবস্থান দ্রুতই বদলে গেল। সেই অবস্থা দখলে নিল একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি, নতুন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে। অর্থাৎ, 'অর্থনৈতিক জীবনের মূল মাপকাঠি জমি থেকে রূপান্তরিত হয় মুদ্রায়।' (আনিসুজ্জামান, ২০১৪ : ২৬) এরই ফলে পুরোনো জমিদাররা ক্ষমতা-কর্তৃত্ব যেমন হারায়, তেমনি অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব হারাতে বাধ্য হয়। এরই ফলে নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার খরচটা তারা যোগাতে ব্যর্থ হয়। এই বিষয়টি হিন্দু ও মুসলমান দুই জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

৩.৩

উপরিউক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা যে কেবল 'একটি কেরানি শ্রেণি' তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বিষয়টি এমন নয়। একইসাথে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা এমনভাবে সক্রিয় ছিল যে, কার্যত ভারতে সমস্ত জনগণ, মোটা দাগে শ্রেণির হিসেবে, দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। যে শ্রেণি ইংরেজের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল, তারাই স্বদেশ ও স্বদেশ-সম্পৃক্ত নিজস্ব বিষয়-আশয়কে বাতিল আর অকেজো করে দেওয়ার চেষ্টায় সক্রিয় ছিল। সভ্যতার হিসাব-নিকেশের বেলায় ভারতীয় সকল প্রপঞ্চকেই পাশ্চাত্যের প্রপঞ্চের বিবেচনায় বিচার করে অস্বীকার করা হয়েছিল। 'আধুনিক' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় কেবল গ্রাম সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙন ধরেছিল, ব্যাপারটি এমন নয়; একইসাথে সেই ভাঙনের শিকার প্রান্তিক মানুষের ভাগ্যে 'অসভ্যের' তকমাও জুটেছে। কিন্তু বাস্তবে, বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসের প্রকৃত অনুসন্ধান-প্রক্রিয়া এর বিপরীত তথ্য সরবরাহ করে। এই বিষয়ে হেগেলের উক্তি প্রণিধানযোগ্য, 'The History of the World travels from East to West, for Europe is absolutely the end of History, Asia the beginning.' (Hegel, 2001 : 121)

সভ্য-অসভ্য—এই শব্দযুগল বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে *আরণ্যক* উপন্যাসে। কলকাতাকেন্দ্রিক 'মেট্রোপলিটন' মেজাজ-মর্জির প্রভাবে প্রভাবিত সত্যচরণের মুখ দিয়েই বিভূতিভূষণ বারবার উচ্চারণ করিয়েছেন এই শব্দযুগল। কিন্তু এই যে সভ্যতার বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য, সত্যচরণ যে কাজটা পর্দার আড়ালে করেছে, তার সব মাল-মশলার যোগানদাতা ছিল ইংরেজ উপনিবেশ; এবং এই বিষয়-সম্পৃক্ত শিক্ষা-প্রকল্প নিয়েও হাজির হয়েছিল তারা। এমনকি 'আধুনিক' সাহিত্যও যে নগরীয় নানান কীর্তিকলাপের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, সেই বিষয় দীপ্তি ত্রিপাঠীও স্বীকার করেছেন। তাঁর কবিতা বিষয়ক সমালোচনামূলক গ্রন্থে বলেছেন, আধুনিক কবিতার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হবে, 'নগরক্রেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত।' (দীপ্তি, ১৯৯৭ : ২)। সেই নগরীয় পরিস্থিতি নির্মাণে এবং নগরীয় হতাশার সৃষ্টিতে যে উপনিবেশ পুরোপুরি দায়ী, সেই বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে এই উপন্যাসে, সত্যচরণ চরিত্র-নির্মাণ-প্রক্রিয়ায়। কিন্তু এর বাইরে রয়ে গিয়েছিল বিরাট এক জনগোষ্ঠী।

এই সভ্য-অসভ্যের হিসাবটা কেবল যে ইংরেজ আমলেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, বিষয়টা তেমন নয়। ভারতীয় ইতিহাসে আর্যায়নের যে ঐতিহাসিক পাঠ চালু আছে, সেই হিসেবেও 'আর্যাবর্ত' ও 'ম্লেচ্ছ'—এই দুই বিপরীতধর্মী চিন্তা-আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে ভারতীয় পুরাণের এই হিসাব হাল আমলে অনেক ঐতিহাসিকই মেনে নেননি। কারণ ইংরেজ আমলে 'সোনালী ভারতের' সূত্র নির্মাণে কেবলই আর্য-উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ উৎসের বিবেচনায়, এবং এইসব উৎস-প্রাপ্ত ভৌগোলিক বর্ণনা ও সূত্রে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা অনেকটাই ভিন্নতার দাবিদার। এই বিষয়ে রোমিলা থাপারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য:

> আর্য জাতিত্বের ধারণা ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ... আর্যরা একটা আলাদা সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী, কিন্তু তা বলে একটা আলাদা জাতি বা রেস নয়। এর আরও প্রমাণ পাওয়া যায় পুরাকালের ঐতিহাসিক উৎসগুলো থেকে, যেখানে আর্যদের দেশ বলতে আর্যাবর্ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এক একটি উৎসগুচ্ছে কিন্তু আর্যাবর্তের সংজ্ঞা এক একরকম–উৎসগুলি যেসব বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান থেকে এসেছে সেই অনুযায়ী। পরবর্তী-বৈদিক সাহিত্যে আর্যাবর্ত বলতে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব ও তার আশপাশ। তার বাইরে যে ভূমি তা সাধারণভাবে ম্লেচ্ছদেশ। সেখানে আমাদের বলা হয় যে মগধ ও অঙ্গ (বিহারের পাটনা, গয়া, মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলা) 'সংকীর্ণ-জাতি' (মিশ্র বর্ণ)-অধ্যুষিত এবং আর্যদের উপযুক্ত নয়। জৈন উৎসগুলিতে কিন্তু এসব আর্যাবর্তেরই অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধ উৎসগুলিতেও তাই। (রোমিলা, ২০১৭ : ৬)

সত্যচরণের যে মেট্রোপলিটন মন নির্মাণ করে দিয়েছে নগর কলকাতা, সেই প্রভাবই এই বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আর সত্যচরণের মানস-জগৎ তৈরির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা; যা স্পষ্টকারে বিভাজন-রেখা তৈরি করেছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে। বিষয়টি অন্যান্য বিষয়ের মতো সভ্যতার হিসাব-নিকেশের বেলায়ও ছিল সত্য। আর এই বিষয়ই সত্যচরণের সাথে ভারতীয় গড় জনগণের ফারাক নির্মাণ করেছে। 'আর্যাবর্ত' শব্দটি এই প্রক্রিয়ায় বিবেচ্য। যা স্পষ্টতই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে, ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রকল্পের ছত্রছায়ায় সম্পাদিত হয়েছে। এমনকি এই ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রকল্পের ছত্রছায়ায় সৃষ্ট নাগরিক মানসিক পরিস্থিতিতে আদিম অবস্থার কথা উল্লেখ করেই সত্যচরণের মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণি উপনিবেশের সহায়ক শক্তি হিসেবে আদিবাসীদের উচ্ছেদ-প্রকল্পে সহায়তা করেছে। যা স্পষ্ট হয়েছে *আরণ্যক* উপন্যাসে, সত্যচরণের কর্মকাণ্ডে।

৩.৪

সভ্য-অসভ্যের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে ইংরেজ আমলে 'সাহেব-কর্তৃক' ভারতীয় ইতিহাস নির্মাণ-প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করলে। ইতিহাস নির্মাণ-প্রক্রিয়া সবসময় সরল পথে চলে না। ইতিহাস নির্মাণ হয় ক্ষমতাকে কেন্দ্রে রেখে; ক্ষমতার ওপর সওয়ার হয়ে, তারই দিক-নির্দেশনায়। 'উনিশ শতকের উদারনৈতিক ঐতিহাসিকরা নিশ্চিতভাবেই এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন ও উৎসাহ দিয়েছিলেন, আর তার স্থলে ভুল নেই।' (কার, ২০১৫ : ২৫) ইচ্ছে করলেও এই বিষয়টি এড়িয়ে চলার কোনো সরল পথ থাকে না। ভারতীয় ইতিহাস রচনার বেলায়ও এই একই বিষয় কার্যকর থেকেছে, এখনো তা রয়েছে। ভারতে প্রাচীন যুগের ইতিহাস 'নানা প্রসঙ্গে' সুলভ নয়। আবার মধ্যযুগের ইতিহাসও ভারতের মুসলিম শাসনের এবং শাসকদের বিষয়-আশয় নিয়েই রচিত হয়েছে।

কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ইতিহাস হলো 'মানুষদের একটা সময়ের বিজ্ঞান।' (ব্লক, ২০১৭ : ১৭) ইংরেজ ভারতের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ভারতীয় ইতিহাস নির্মাণ-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শে নির্মিত হয়েছে। যা প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ পূর্বে ইতিহাস কেবল রাজাদের এবং তাদের শাসনামলের প্রশংসায় লিখিত হলেও সেই ইতিহাস ভারতীয় সীমানা ও সীমানাসম্পৃক্ত বিষকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখায়নি। কিন্তু আঠারো শতকের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে, ভারতে যে 'নবযুগের' সূচনা হয়েছিল, সেই যুগে 'নিজস্ব বিষয়-আশয়'-এর মতো 'নিজস্ব ইতিহাস নির্মাণ' ব্যাপারটি নানানভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। *আরণ্যক* উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্বয়ান করেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। *আরণ্যক* উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে ভারতীয় আদি ইতিহাসের নানা বিষয় একত্র করেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ করে 'আধুনিকতা', 'সভ্য-অসভ্য'–এই বিষয়সমূহের প্রতিষ্ঠাকল্পে আদি ও অকৃত্রিম ভারতীয় ইতিহাসকে বাতিলকরণের বিরুদ্ধ-প্রকল্প নিয়ে হাজির হয়েছেন ঔপন্যাসিক।

৩.৫

নতুন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ইংরেজ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল, তাদের প্রায় সকলের কোনো-না-কোনো চাকরির নিশ্চয়তা ইংরেজ উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে করতে পেরেছিল। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে এই শ্রেণি হয়ে ওঠে বিপুল। এই বিপুল শ্রেণির কর্মের নিশ্চয়তা বিধান পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বেকারত্বের বিষয় একসময় স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার নানা সময়ে নানারকম যুদ্ধবিগ্রহে যে ইংরেজ জড়িয়ে পড়েছিল, সেই যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয়ের একটা বড়ো অংশ বহন করতে হয়েছে ভারতীয় জনগণকে। যার প্রভাব ভারতের অর্থনীতিতেও পড়েছে। আবার এই শ্রেণির যে মনস্তত্ত্ব, ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্মাণ করে দিয়েছিল, সেই মনস্তত্ত্বের সংকটাবস্থায় নগর ছেড়ে গ্রামীণ সমাজে ফিরে যাওয়ার মতো অবস্থাও তখন আর নেই। এই শ্রেণিই শেষাবধি কলকাতা-কেন্দ্রিক জমিদারশ্রেণির সহায়ক শক্তি হয়ে জমিদারি দেখভালের দায়িত্ব পালন করেছে। এবং এর পেছনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। কার্য-কারণ সূত্র হিসাবেও বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ।

সত্যচরণও ঠিক এমনই এক চরিত্র, যে কলকাতায় উচ্চশিক্ষিত হয়েছে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত চাকরি পায়নি। পড়ালেখা শেষে তাকে বেকার জীবন যাপন করতে হয়েছে। এবং এক পর্যায়ে নবোদ্ভিন্ন জমিদারশ্রেণির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতেও বাধ্য হয়েছে এই চরিত্র। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে উদ্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বর্ধিত হয়েছে ক্রমান্বয়ে; কিন্তু সেই হারে তো চাকরির সুযোগ বাড়েনি। এরই ফলে সত্যচরণের মতো শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যে জমিদারের 'কেজো লোক' হয়ে উপনিবেশের প্রশাসনের প্রশাসক রূপে কাজ করেছে—এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু এই শ্রেণিই যে উপনিবেশিত অঞ্চলের নিসর্গ ধ্বংসের জন্য এককভাবে দায়ী—তাও জোর দিয়ে বলা যাবে না। কারণ পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল এমন যে, সত্যচরণের মতো যুবকদের এই কর্মে নিয়োজিত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ইচ্ছে করলেও তাদের অন্য গন্তব্য খুঁজে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ইচ্ছে না-থাকা সত্ত্বেও 'গভর্নমেন্টের রেভিনিউ' দেওয়ার জন্য জমিদারদের কাছ থেকে ক্রমাগত চিঠি আসার পর সত্যচরণ শেষমেশ বাধ্য হয়েই জমি বন্দোবস্ত করেছে। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের সহায়তায় পতিত বা জঙ্গলমহলসহ আরো নানা ধরনের শ্রেণিবিভাজিত যে জমি ছিল, তা ক্রমান্বয়ে চাষের ভেতরে নিয়ে আসা হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে ভূমিব্যবস্থা ছিল, সেই ব্যবস্থা আর থাকলো না ইংরেজ আমলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে। অর্থাৎ জমির মূলস্বত্বভোগীই বদলে গেল। (সুপ্রকাশ, ২০১৭ : ৬৯) তাই উন্নয়নের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাজু পাঁড়ে যখন বলে, 'লবটুলিয়া উন্নতির জায়গা' (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ১২৮), তখন এই উন্নতির প্রসঙ্গ মিলিয়ে পড়া জরুরি হয়ে পড়ে ইংরেজ শাসনামলের ইংরেজ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন-প্রকল্পের সাথে। এই উন্নয়নের শেষ পর্যায়ে 'গ্রান্ট সাহেবের বটগাছের মহিমাও ধ্বংস হইল।' (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ১৩০) এরই সাথে গ্রান্ট সাহেবদের স্বার্থটাও উন্মোচিত হয়ে গেল। কোনো অনুসন্ধানী মনোভাবের বশবর্তী হয়ে গ্রান্ট সাহেবরা এই অঞ্চলে আসেনি, এসেছিল উপনিবেশের ভিতটার পত্তন করতে—এই বিষয়ও স্পষ্ট হয়েছে গ্রান্ট সাহেবের বটগাছের পরিসমাপ্তির মাধ্যমে। এবং এই প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যতে জঙ্গলমহলে 'আধুনিকায়নের' একটা কল্পিত চিত্রও উপস্থাপন করেছেন বিভূতিভূষণ। যা নানামাত্রিকতায় ধ্বংসাত্মক।–

> তামার কারখানার চিমনি, ট্রলি লাইন, সারি সারি কুলিবস্তি, ময়লা জলের ড্রেন, এঞ্জিনঝাড়া কয়লার ছাইয়ের স্তূপ– দোকানঘর, চায়ের দোকান, সস্তা সিনেমায় 'জোয়ানী-হাওয়া' 'শের শমশের' 'প্রণয়ের জের' (ম্যাটিনিতে তিন আনা, পূর্বাহ্ণে আসন দখল করুন)– দেশী মদের দোকান, দরজির দোকান। হোমিও ফার্মেসি। (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ১৩৮)

এই আলোচনা শেষে মোটামুটি এই বিষয়ই স্পষ্ট হলো যে, ব্রিটিশ পুঁজির উদ্ভব ও বিকাশে, এবং

উপনিবেশের নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই উদ্ভব হয়েছে সত্যচরণের মতো যুবকের। এবং এমন একটা শৃঙ্খলা ইংরেজ চালু করেছে যে, সেই শৃঙ্খলার বাইরে গিয়ে কিছু করার ক্ষমতাও হারিয়েছে সত্যচরণের মতো যুবকরা। আদতে সত্য একটাই, 'ভূমিপুত্রদের একটাই পথ : দাসত্ব অথবা প্রভুত্ব।' (ফানো, ২০১৭ : xi) কার্যত 'প্রভুত্বটা'ও দাসত্বই বটে। সত্যচরণ এর উদাহরণ।

৩.৬

আরণ্যকে উপন্যাসের মুসম্মত কুন্তা চরিত্রের যে রূপায়ণ, তা সুস্পষ্টভাবে নতুন ও পুরোনো সমাজ সম্পর্কে স্পষ্টতা প্রদান করেছে। কুন্তার মতো রূপবান চরিত্রের রূপের ক্ষয়িষ্ণুতা কেবল কুন্তার সাথেই সম্পৃক্ত নয়; তা বহুসূত্রের সত্যতা-জ্ঞাপক-চিহ্ন হিসেবে কার্যকর থাকবে। ইংরেজ আমলে নতুন জমিদারশ্রেণির সাথে পুরোনো জমিদারশ্রেণির যে পার্থক্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, সেই পার্থক্যের বিষয়টি কেবল অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথেই সম্পৃক্ত ছিল না। একই সাথে পুরোনো জমিদারশ্রেণির সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক নানা শ্রেণির জীবনযাপনের পরিবর্তনও এই প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হয়েছে। তাই কেবলই 'নতুন-পুরোনোর' সীমানা 'কেন্দ্র-প্রান্তের' অর্থনৈতিক অবস্থানের সাথেই সম্পৃক্ত নয়; বিষয়টি পূর্বের ক্ষমতা-কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত শ্রেণির উপর ভিত্তি করেও বহুবিধ পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে থাকবে। কুন্তা এই পরিবর্তনেরই সাক্ষী-চরিত্র। কিন্তু কুন্তার জীবনযাত্রা হঠাৎ পরিবর্তিত হয়নি। পরিবর্তনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে নতুন এক শ্রেণি। সেই শ্রেণিকে চিহ্নিত করেছেন বিভূতিভূষণ; বর্ণিত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজে, ভঙ্গিমায়। ফলে আধুনিক সময়ে আধুনিক ঔপন্যাসিকরা যেভাবে 'এইসব বিষয়ের' পাল্টা বয়ান তৈরি করেছেন, ঠিক তার বিপরীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার প্রতিরোধ-বয়ান তৈরি করেছেন বিভূতিভূষণ। আর এই বিষয়টিই মূলত কুন্তা চরিত্রের আদলে, কুন্তা চরিত্রের বিবর্তনে বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে *আরণ্যক* উপন্যাসে।

নতুন সমাজের প্রভাবে পুরোনো সমাজের ভাঙনের মাধ্যমে কেবলই উপরি আর অন্তর্নিবিষ্ট-কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয় না। একইসাথে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ভাগ্যও বদলে যেতে থাকে। *আরণ্যক* উপন্যাসের কুন্তা চরিত্রের ভাগ্য বদলের হিসাবও এই সমাজের ভাঙন এবং নতুন সমাজের গড়নের মধ্যে প্রোথিত। সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সাংঘর্ষিক সম্পর্কই কুন্তার ভাগ্য-নিয়ন্তা হিসাবে কাজ করেছে। এই বিষয় মধ্যযুগের গ্রাম সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙনের ফলেই নির্মিত হয়েছে, আর যে ভাঙনের বীজ লুকায়িত ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের অভ্যন্তরে। ঔপনিবেশিক আধিপত্যের ফলেই এই ভাঙন সম্পন্ন হয়েছিল। এই বিষয় দেবী সিং-এর পতন এবং রাসবিহারী সিং-এর উত্থানের ভেতর দিয়েই স্পষ্ট করেছেন ঔপন্যাসিক। বিভূতিভূষণ কুন্তা সম্পর্কে বলছেন :

> ঐ কুন্তাই দেবী সিং রাজপুতের সেই বিধবা স্ত্রী। এক সময়ে ও লবটুলিয়া থেকে কিংখাবের ঝালর-দেওয়া পালকি চেপে কুশী ও কলবলিয়ার সঙ্গমে স্নান করতে যেত, বিকানীর মিছরি খেয়ে জল খেত–আজ ওর ওই দুর্দশা! আরো মুশকিল এই যে বাইজীর মেয়ে সবাই জানে বলে ওর এখানে জাত নেই... (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ৩২)

৩.৭

রাজনারায়ণ বসু তাঁর *সেকাল আর একাল* গ্রন্থে জানাচ্ছেন যে, কলকাতায় উপনিবেশ-প্রভাবিত নাগরিক জীবন শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ভারতীয় জনগণ আরো বেশি বলবন্ত ও স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। (রাজনারায়ণ, ১৭৯৬ : ৩১) এই গ্রন্থে ভারতীয় জনগণের স্বাস্থ্য ও শৌর্য-বীর্য বিষয়ে রাজনারায়ণের বর্ণনা নানান কারণে বাহুল্য দোষে দুষ্ট হলেও রাজনারায়ণের এই উক্তি একেবারে খারিজ করে দেওয়ার মতো বিষয় নয়। কারণ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভাসের সাথে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই বটে। বিশেষ করে, সমস্যা যেহেতু হয়েছে নগরের উদ্ভবের ফলে, নগরীয় জীবনযাপন-প্রভাবে

একটা অঞ্চলের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে। এবং 'আধুনিক' মানুষের জীবনযাপনের যে পদ্ধতির চালু হয়েছিল 'নাগরিক' জীবনে—সে বিষয়ে রাজনারায়ণ বসু বলছেন যে, এই জীবনযাপন-পদ্ধতিই অভিশাপ হয়ে নিজস্ব স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার ভাঙনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাপনের প্রচলিত রীতিনীতি পরিবর্তনের ফলেই এই বিষয়টি সম্পাদিত হয়েছে। এই বিষয় আরো স্পষ্ট হয় ভারতে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্যনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে। এই বিষয়ে দীপেশ চক্রবর্তীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> শরীরের সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী? একটু ভাবলেই বোঝা যাবে সম্পর্কটি জটিল ও গভীর। পরিবার-পরিকল্পনা থেকে শুরু করে মহামারি নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত সবর্ত্রই দেখা যায় আমাদের এই তথাকথিত নিতান্ত 'ব্যক্তিগত' বস্তুটির সঙ্গে সরকারের সম্বন্ধের নজির। বুর্জোয়া সভ্যতা মানুষের শরীরকে যেভাবে ব্যবহার করে ও যে তাৎপর্য দেয়, তা প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শরীরের যে অবস্থান থাকে তার থেকে আলাদা। 'কৃষক-শরীর', 'আদিবাসী-শরীর'কে ভেঙে-চুরে, দুমড়ে-মুচড়ে, নতুন অভ্যাসের ফাঁদে
>
> ফেলে, নতুন রুটিনের ছাঁচে ঢেলে তবে তো তৈরি হয় শ্রমিকের শরীর, বিপণন সমাজের অসংখ্য ভোগ্যবস্তুর ক্রেতার শরীর, ফ্যাশন-ম্যাগাজিনের স্বাস্থ্য-পত্রিকার শরীর। (দীপেশ, ২০১৫ : ১৬১-১৬২)

এই ধারণা সমানভাবে প্রযোজ্য *আরণ্যক* উপন্যাসের চরিত্রসমূহের ক্ষেত্রে, এবং উপন্যাসে বিধৃত বিভূতিভূষণের স্বাস্থ্য-বিষয়ক চিন্তায়। *আরণ্যক* উপন্যাসে ভারতীয় জনগণের জীবনযাপন যেমন সহজিয়া দর্শনের ধারা ও ধারণায় পরিচালিত হয়েছে; ঠিক একইভাবে স্বাস্থ্য-দর্শনের বেলায়ও বিবেচ্য। *আরণ্যক* উপন্যাসের চরিত্রসমূহের খাদ্য, খাদ্যাভাস এবং স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, প্রাক-ঔপনিবেশিক জনগণ 'আধুনিক' জনগণের তুলনায় নানান দিক থেকে সুস্থ ছিল; বলবন্তও ছিল বটে। কিন্তু নগরীয় জীবনযাপন আর পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে উৎপন্ন ভোগবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় এই বিষয়টি টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। এর পেছনে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় সৃষ্ট 'নগর' এবং নতুন 'নগরে' সৃষ্ট নাগরিক পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তাদের জীবনযাপন-পদ্ধতিও এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। কারণ নাগরিক এই শ্রেণিই পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতীয় জনসমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারটিও এই বিষয়ের অন্তর্গত হবে।

এই বিষয়ে যে কেউ দারিদ্র্যের কথা টেনে আনতে পারেন। কারণ 'আধুনিক' জনসমাজে দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করা হয় নগদ অর্থের মানদণ্ডে, ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্য হিসাবে। কিন্তু এই দারিদ্র্য 'আধুনিক' সমাজের আর্থ-উৎপাদনের নিরিখে দারিদ্র্য হিসাবে বিবেচিত হলেও প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতীয় জনসমাজে এই বিষয় একেবারেই স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পরিগণিত হবে। দারিদ্র্য বিষয়টি যেহেতু মৌলিক অধিকারের সংস্থানের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত—এই জন্যই এই বিষয়টি বলা হলো। কিন্তু এটি বিভূতিভূষণের উদাহরণের মধ্য দিয়ে মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। *আরণ্যক* উপন্যাসে এই বিষয় বারবার উল্লেখিত হয়েছে। 'এই বয়সে উহার স্বাস্থ্য দেখিয়া অবাক হইলাম। সাহসও যে আছে ইহা মনে মনে স্বীকার করিতে হইল।' (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ১৯) আছে এরও কারণ; ভারতীয় স্বতন্ত্র খাদ্য-ব্যবস্থা, খাদ্য-উপাদান। (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ২৭-২৮) আধুনিক মানুষের বেহিসাবি জীবনযাপন বিষয়ে একটা গোপন সংকেত দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। বিভূতিভূষণ জঙ্গলমহলে আধুনিক মানুষের একদিনের এক পিকনিকের বর্ণনা দিয়েছেন। সেই বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে, 'ন্যাটিভদের' ভূমি নষ্ট করার ক্ষেত্রে কারা ভূমিকা রাখছে। কারা শ্যামল নিসর্গকে নগরীয় উপাদানে দূষিত করেছে। ব্যাপারটা সামান্য কথায় বিপুল আকার ধারণ করেছে।

৩.৮

সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের সৃষ্টির পেছনে প্রধানত নেতৃত্বে ছিল মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত শ্রেণি। বিভূতিভূষণ নিজেও এই শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেন। এই কারণে ভারতের আদি জনগোষ্ঠীর সমাজের-ভাঙনটা বিভূতিভূষণ ধরতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে শহরের মেট্রোপলিটন মেজাজ-মর্জি দ্বারা শিক্ষিত জমিদারের সহায়ক সত্যচরণের প্রথম যে সমস্যা হচ্ছিল, তা হচ্ছে জঙ্গলমহলের পরিবেশের সাথে তাল মেলাতে না পারা। জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রয়োজন যে নেই, তা বলা পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদ নির্মাণ-প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ-প্রকল্প একসাথে বিশ্বাসঘাতকাতারই নামান্তর। কারণ উনিশ শতকের পরবর্তী সময়ে ভারতীয় যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ঔপনিবেশিক শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে জাতীয়তাবাদের যে খসড়া নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল—সেই জাতীয়তাবাদের অন্দরে পড়ে 'নিজ বাসভূমি' থেকে বিতাড়িত না হলেও একরকম একঘরে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী।

অর্থাৎ '...জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও আন্দোলনও ঐ স্বপ্নজাত কিন্তু বিভূতিভূষণ দেখেছিলেন সাধারণ মানুষ-কৃষক-শ্রমিকদের বাহুনির্ভর এই আন্দোলন মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের নেতৃত্বে আর স্বপ্নময় থাকে না, হয়ে ওঠে এক বদ্ধ জলাশয়ের পাঁক।' (পার্থপ্রতিম, ১৯৯২ : ১২) এ বিষয়ে বলতেই হয় যে কেবলি রাজনৈতিক বিষয় জাতীয়তাবাদের মূল প্রত্যয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। 'Nationalism had, and has, much to do with understanding one's society and finding one's identity as a member of that society. It cannot be reduced merely to waving flags and shouting slogans and penalizing people for not shouting slogans like 'Bharat Mata ki Jai'.' (Thapar, 2016 : 11)

রাজা দোবরু পান্না ঠিক এই শ্রেণিরই পরিচায়ক-চরিত্র হিসেবে *আরণ্যক* উপন্যাসে আবির্ভূত হয়েছে। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে যে কেবলই 'নবজাগরণ' ও 'আলোকায়ন'-প্রভাবিত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণিই অংশগ্রহণ করেছিল, ব্যাপারটি এমন নয়। এই আন্দোলনে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীও সমানভাবে দায়িত্ব পালন করেছে; এবং ছিল তাদের সক্রিয় ভূমিকা। কিন্তু নানা কারণে তাদের সেই অবদানকে সুকৌশলে বাতিল করে দেওয়ার প্রবণতা দৃশ্যমান হয় মূলধারার জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক-প্রকল্পে; বাস্তবে ব্যাপারটি একেবারেই অযৌক্তিক। কিন্তু সে চিন্তাকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির বুদ্ধিজীবী যেমন গ্রহণ করেছে, তেমনি করে পরবর্তী সময়প্রবাহেও এই বিষয়কে বেশ জোরের সাথে সমর্থন করার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্যাপারটি কেবলই আবেগী দুঃখের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া যায় না। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য হলেও তা বিবেচনায় নেওয়া হয় না। গুরুত্বপূর্ণ লোকজনের লেখায় তা প্রমাণিত হয়।

এইক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতিক্রম। তিনি *আরণ্যক* উপন্যাসে নৃগোষ্ঠীর জাতিসত্তাকে বাতিল করে দেননি; গুরুত্বের সাথে তা উপস্থাপন করেছেন। এমনকি দোবরু পান্না ও ভানুমতির আলোচনায় আদি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর বিষয়টা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। দেখিয়েছেন পাথরের শিলালিপির সাথে হিসাব কষে, সভ্যতার দীর্ঘদিনের ইতিহাস মিলিয়ে। সভ্য-অসভ্যের বিষয়ও এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। এই বিষয়ে আরো বলার থাকে যে, সমগ্র পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ উপনিবেশিত অঞ্চলের নৃগোষ্ঠী ও নৃগোষ্ঠীর ইতিহাসকে নানানভাবে অবদমিত করলেও নিজেদের বেলায় তাদের প্রকল্প ছিল ভিন্ন। বরঞ্চ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এই বিষয়টা। কারণ একই, সভ্যতার বৈশ্বিক ইতিহাসে নৃগোষ্ঠীর সভ্য হওয়া না হওয়ার ইতিহাস বেচে সাম্রাজ্য গড়ে তোলা।

যেহেতু আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা ইউরোপীয় ইতিহাসের ফসল, (পার্থ, ২০১৭ : ৭১) ফলে এই বিষয় ভারতে সরাসরি অনুকরণের ভিত্তিতে প্রয়োগে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। দোবরু পান্না কিংবা ভানুমতি যে তাদের কর্তৃত্ব হারিয়েছে, এবং নিজ দেশে পরাধীনতায় দিনযাপন করছে—তার পেছনে এই 'আধুনিক

রাষ্ট্র-আদর্শের' সাথে আদিম জনগোষ্ঠীগুলোর সাংঘর্ষিকতাও বিশেষভাবে কার্যকর থেকেছে। এই বিষয় দোবরু পান্নার উক্তিতে আরো সত্য হয়ে ওঠে। 'আমি যৌবন বয়সে কোম্পানির সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়স অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তারপর আর কিছু নাই।' (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ৮৯) ফলে জাতীয়তাবাদী চিন্তা, আধুনিক রাষ্ট্র-আদর্শ, আদিম জনগোষ্ঠী—এই বিষয়সমূহের সাংঘর্ষিকতার নানা বিষয় বিভূতিভূষণকে ভাবিয়েছিল। যা উপস্থাপিত হয়েছে এই উপন্যাসে; নির্মাণ-বিনির্মাণের ভিতর দিয়ে।

৩.৯

উপনিবেশিত অঞ্চলে উপনিবেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক আধিপত্য-পরিস্থিতিতে উপনিবেশিত অঞ্চলের অবকাঠামোগত নানান বিষয় যেমন প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়, তেমনি করে একইসাথে উপনিবেশিত ভূমির শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিও নানাভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিচর্যায় শাসক, শাসন-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, নানা শ্রেণি-চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন *চর্যাপদে*র ক্ষেত্রে যদিও এই বিষয়টি পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়; কিন্তু সামাজিক হিসাবে তা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ধর্মীয় অনুষঙ্গে *চর্যাপদে* যে সমস্ত কবিতা সৃষ্টি হলো, এর পেছনে বৌদ্ধ ধর্মের বর্ণ-ধর্ম-বিষয়ক আধিপত্যের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ক্ষমতা-কাঠামো ও ধর্মীয়-রাজনৈতিক আধিপত্যের নানা বিষয়। আবার মধ্যযুগের অধিকাংশ সাহিত্যই রচিত হয়েছে সামন্ত-শাসক ও সামন্ত-শাসনের আনুকূল্যে। এই সময়ে সামন্ত-শাসন-শৃঙ্খলায় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নানান বিষয় প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের অপর দুই যুগের মতো 'আধুনিক' যুগের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নির্মাণে ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থার নিবিড় তত্ত্বাবধান ও ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে 'আধুনিক' যুগের ভিত্তিই নির্মিত হয়েছে ইংরেজদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে। আর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যে বদলে গেল, এর পেছনে ইংরেজদের বিভিন্ন আইনের মতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছিল তাৎপর্যবহ প্রভাব। প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নির্মাণে ভূমি-ব্যবস্থার ভূমিকা বিশেষ। উনিশ শতকে এসে এর পরিবর্তন হলেও সম্পর্কটি ছিন্ন হয়নি। কারণ উনিশ ও বিশ শতকে আধুনিকতার বিষয় আসলেও উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সক্রিয় থেকেছে ভূমি-নির্ভর সামন্ত-অর্থনীতি। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক জমিদারশ্রেণি এবং সত্যচরণের মতো শিক্ষিত শ্রেণির কাছে আর প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রাধান্য পায়নি। এই কেন্দ্রনির্ভর শাসনব্যবস্থা নানা অজুহাতে খারিজ করেছে প্রাক-ঔপনিবেশিক শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে। এই বিষয়ই *আরণ্যক* উপন্যাসে স্পষ্ট হয়েছে।

আরণ্যক উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক-ঔপনিবেশিক শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করেছেন এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে। নৃগোষ্ঠী ও কৌমের জীবনযাপনের ছাঁচে নির্মিত শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন তিনি। আদতে ' 'শিল্প একটি সামাজিক ক্রিয়া', এবং শিল্পী হচ্ছেন সমাজচৈতন্যের রূপকার।' (সৈয়দ আজিজুল, ২০০৩ : ১) *আরণ্যক* উপন্যাসে ধাতুরিয়ার নাচ, কবি বেঙ্কটশরের কবিতা, 'ননীচোর নাটুয়া' দশরথের অভিনয়কলা, ভিটলদাসের ছক্কর-বাজি নাচসহ আরো নানানরকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ঐ নির্দিষ্ট সমাজের স্বাভাবিক সামাজিক ক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু এই বিষয়সমূহ নানা মানদণ্ডে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে প্রভাবিত এবং কলকাতায় পড়ালেখা করা সত্যচরণের মতো মধ্যবিত্ত যুবকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। এমনকি এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে আমলে নিয়ে স্বীকৃতি দেওয়ার বদলে এক ধরনের সন্দেহমূলক আচরণ দেখা গেছে সত্যচরণের মানস-জগতে। আর এই মানস-জগৎ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব, বন্দোবস্তের ফলাফল। এবং এই বিষয়ের মাপকাঠিও পশ্চিমা নিক্তিতে মাপা হয়েছে। 'পশ্চিমা সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে।' (সাঈদ, ২০১৯

: ৫৪)—বিষয়টি উপনিবেশিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্বীকার করে, জরুরি প্রপঞ্চ হিসেবে বিবেচনা করে। তাই চিন্তার এই শ্রেণি-আধিপত্য থেকে বের হওয়াও সম্ভব হয় না। আবার এই সাংস্কৃতিক আধিপত্য, যা বিশেষভাবে সম্পৃক্ত মানসিকতায়, তার পরিবর্তন উপনিবেশোত্তরকালেও দৃশ্যমান হয়।

এছাড়াও এই উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো দোবরু পান্নার বাড়ির নানান জায়গায় অঙ্কিত চিত্রাবলি। বিশেষ করে 'দেওয়ালে গিরিমাটির রং, পদ্মগাছ ও ময়ূর আঁকা, শালকাঠের খুঁটির গায়ে লতা ও ফুল ছড়ানো।' (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ১০৪) ঔপনিবেশিক মানসিকতার প্রভাবে নবোদ্ভিন্ন মধ্যবিত্ত সত্যচরণ দোবরু পান্নার বাড়ির নানান জায়গায় অঙ্কিত চিত্রাবলি শিল্প হিসেবে স্বীকার করে না, এটাই স্বাভাবিক। শিল্পের ক্ষেত্রেও 'বুর্জোয়া দেশগুলোর উচ্চবিত্তের জীবনযাপনকে আদর্শ ধরে নিয়ে মধ্যবিত্ত সেটাকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করতে শুরু করে।' (আখতারুজ্জামান, ২০১৭ : ২৬) কিন্তু কেবলই বুর্জোয়া আদর্শকে মেনে দোবরু পান্নার গৃহের শিল্পকে বাতিল করে দেওয়া সমীচীন হবে না। বিভূতিভূষণ তা দেননি। গুরুত্বের বিবেচনায় *আরণ্যকে* উপস্থাপন করেছেন। এর অন্যতম কারণ এই যে, এই শিল্পের একটা নির্দিষ্ট কার্য-কারণ সূত্র রয়েছে। কারণ দোবরু পান্নার বাড়ির নানান জায়গায় অঙ্কিত চিত্রাবলি দোবরু পান্নার দৈনন্দিন জীবনযাপনের সাথে সম্পৃক্ত। গৃহের সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যই কেবল এই শিল্পের উদ্ভব নয়, এর সাথে স্বাদেশিক নানা অনুষঙ্গেরও সম্পর্ক রয়েছে। আবার এই শিল্প নিছক আনন্দবাদী কিংবা 'শিল্পের জন্য শিল্পের' মতো নয়। কার্যকর যাপিত জীবনের হিসেবে।

৩.১০

আরণ্যক উপন্যাসে সত্যচরণ চরিত্র 'মেট্রোপলিটন মনের' উদ্ভবের প্রক্রিয়ায় এই উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে, বিষয়টা কেবলই তা নয়। একইসাথে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে নাগরিক মধ্যবিত্তের 'মেট্রোপলিটন মনের' বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসমাজ সম্পৃক্ত সহজিয়া জীবনযাপনের চিত্রও বিশেষভাবে, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। গনু মাহাতোর মতো চরিত্রের নির্মাণ-প্রকল্প এই বিষয়ই স্পষ্ট করেছে। (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ১৮) আবার ভারতীয় জনসমাজ সম্পৃক্ত সহজিয়া দর্শনের বিষয় উপস্থাপনে রাজু পাঁড়ের জীবনযাপন-পদ্ধতিও সহজিয়া জীবনদর্শনকে দৃঢ়তা প্রদান করেছে। (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ৪৪-৪৬)

জীবনযাপন-পদ্ধতি সর্বদাই আর্থ-উৎপাদন-কাঠামোর সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় জনগণের জীবনযাপন-পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সেই সময়ের আর্থ-উৎপাদন-কাঠামো। নিশ্চল গ্রাম সমাজ-ব্যবস্থার যে গড়ন ছিল সেই গড়নের প্রভাবে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-উত্তর ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা বদলে গেছে খোলনলচেসহ; এবং ক্রমশই সেই অবস্থা নির্মাণ করেছে *আরণ্যকের* সত্যচরণের জীবনযাপন-পদ্ধতিকে। নিজস্ব অর্থনৈতিক (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ৭৯-৮০) অবস্থা এবং বিনিময় প্রথা (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ১২৩-১২৪) প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের ভারতীয় জনগণের জীবনকে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সেই ধারা আর রক্ষা করা গেল না ঔপনিবেশিক শাসনামলে। ফলে প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতীয় জনগণ জীবনযাপনের জন্য যে জীবনদর্শন গ্রহণ করতে পেরেছিল সেই বিষয় ঔপনিবেশিক সমাজে রক্ষিত হয়নি। কিন্তু এই বিষয়ের জন্য যারা আপিল করতে পারতো তারা তা না করে বরঞ্চ এর পক্ষেই সাফাই গেয়েছে। এই বিষয় বেশ স্পষ্টভাবে *যোগাযোগ* উপন্যাসেও উপস্থাপিত হয়েছে।

এর পশ্চাতে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল ঔপনিবেশিক পরিবেশে গড়ে ওঠা 'নতুন যুগের জীবনদর্শন'। কিন্তু *আরণ্যক* উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঔপনিবেশিক সমাজে সৃষ্ট ভোগবাদী, স্বার্থনির্ভর জীবনদর্শনের বিপক্ষে ভারতীয় জনসমাজের বহুদিনের সহজিয়া জীবনদর্শনকে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি

বিষয়টি সত্যচরণের বিপরীতে রাজু পাঁড়ে ও গনু মাহাতোর মতো চরিত্রের জীবনযাপন-পদ্ধতির ভেতর দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। এই দুইটি চরিত্র মূলত জঙ্গলমহলের রূপকল্পে বিশেষ মূল্যে উপস্থাপিত হয়েছে *আরণ্যক* উপন্যাসে। সাধারণ দৃষ্টিতে তা কেবলই কৌমের দুজন মানুষের জীবনযাপন-পদ্ধতি হলেও বৃহৎ অর্থে বিষয়টি উপনিবেশের নিবিড় তত্ত্বাবধানে নির্মিত নতুন জনসমাজের জীবনদর্শনের পাল্টা বয়ান হিসাবেই নির্মিত হয়েছে।

৪.

বিভূতিভূষণের সাহিত্য-বয়ান-প্রকল্পে কখনই 'উচ্চস্বর-বয়ান'-এর ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হয় না। একটা সতেজ, কোমল আর আধ্যাত্মিক বাণীবিন্যাস বিভূতিভূষণের সমগ্র সাহিত্যজুড়ে লক্ষণীয় বিষয়। এই কারণে বিভূতিভূষণের *আরণ্যক*সহ অন্যান্য উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। এর মানে এই নয় যে, বিভূতিভূষণ ঔপনিবেশিক শক্তির নানান অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির যোগান তাঁর সাহিত্যে দেননি। অবশ্যই তিনি তা দিয়েছেন। তবে সেই বিষয়টি তিনি তাঁর সাহিত্যে করেছেন একেবারেই ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন কৌশলে। সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গির দিক থেকেও বিষয়টি একেবারেই ভিন্নতা আনয়ন করে। *কল্লোলের* লেখকরা বিভূতিভূষণের সমসাময়িক সময়ে যেভাবে তাঁদের সাহিত্যে বয়ান-প্রকল্প নির্মাণ করছিলেন, ঠিক সেই সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্য-প্রকল্পে ঔপনিবেশিক অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সরব স্বর উপস্থাপন করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চৈতালী ঘূর্ণি* উপন্যাস এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। '*চৈতালী ঘূর্ণি*, *কালিন্দী* এবং *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র বেদনাময় শিল্পভাষ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজগতির এই অনিবার্য সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।' (ভীষ্মদেব, ২০২১: ৭৮)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে সংকটের ভেতরে ভারতীয় জনসমাজ পতিত হয়েছিল সেই সমস্যা-বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন বিভূতিভূষণ। তিনি এই বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন বলেই সাহিত্যের বিষয় হিসাবে বারবার গ্রামীণ পটভূমিতে ফিরে গেছেন। *আরণ্যকে*ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এর মানে এই নয় যে, তিনি গ্রামীণ এবং গ্রামনির্ভর লোকসাহিত্যের মতো করে এই বিষয় তাঁর সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তা উপনিবেশের নানা অসংগতি এবং এই অসংগতির প্রতিরোধ-প্রকল্প হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। এই উপন্যাসে ক্রমশই জঙ্গলের প্রতি সত্যচরণের আগ্রহের বিষয়টি একান্তই নগরায়ণ-বিরোধী বয়ান নির্মাণ করেছে। সত্যচরণের চিন্তা ক্রমশই যে বদলে গেছে, এবং এই বদলানোর বিষয়টি যে জঙ্গলমহলেই সম্পাদিত হয়েছে—তা স্পষ্ট করেছেন বিভূতিভূষণ।

যে সত্যচরণ উপন্যাসের শুরুতে জঙ্গলমহলে বসবাস করতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছে, সেই সত্যচরণই সময়ের সাথে সাথে জঙ্গলের এবং জঙ্গলসম্পৃক্ত মানব ও মানবীয় নানান বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছে। যা তার পরবর্তী সময়ের স্মৃতিচারণায়ও স্পষ্ট হয়েছে। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ হলেও গভীর পর্যবেক্ষণ ও অভিক্রিয়া সহযোগে খতিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয় যে, সত্যচরণের মনোভঙ্গি ক্রমশই যে বদলে গেছে, এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে জঙ্গলমহল। আবার রাজু পাঁড়ে চরিত্রে বিরাজমান সহজিয়া দার্শনিকতাও সত্যচরণের মতো যুবকদের কর্মকাণ্ডের বিরোধী চরিত্র হিসেবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। '...ভগবান বুদ্ধের সেই নির্বাণলোকে, যেখানে চন্দ্রের উদয় হয় না, অথচ অন্ধকারও নাই।' (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ৫৯) —এই উক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সহজিয়া দর্শনকে আরো দৃঢ় করেছেন বিভূতিভূষণ। উপন্যাসের শেষদিকে সত্যচরণ তাই বলতে বাধ্য হয়েছে যে :

> আমি প্রজা বসাইবার ভার লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম– এই অরণ্যপ্রকৃতিকে ধ্বংস করিতে আসিয়া এই অপূর্বসুন্দরী বন্য নায়িকার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। এখন আমি ক্রমশ সে-দিন পিছাইয়া দিতেছি। ... কি করিয়াই আমার মন ভুলাইয়াছে চতুরা সুন্দরী। (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ৬৭)

এই বিষয়টি ছাড়াও নানা বিষয়, যা আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক মনে হতে পারে, একত্র করে প্রতিরোধ-প্রকল্প হাজির করেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ করে ' 'ডামাবাণু'–একধরনের জিনপরী' (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ৪১) —এর মাধ্যমে অলৌকিকতাই কেবল প্রকাশিত হয়নি, ঠিক ব্রাজিলের অ্যামাজনের মতো বনরক্ষাকর্ত্রী চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন বিভূতিভূষণ। আবার টাঁড়বারো, 'টাঁড়বারো হোলো বুনো মহিষের দলের দেবতা।' (বিভূতিভূষণ, ২০১৭ : ৭৫), সম্পর্কে সাঁওতাল বুড়োর বর্ণনা আপাতদৃষ্টিতে যে কারো কাছে অসংলগ্ন লাগলেও আদি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর দিক থেকে, ভারতীয় সভ্যতার শক্তির আধার হিসাবে টাঁড়বারো গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসে বিভূতিভূষণ কোনো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বর্ণনা দেননি; তবে মাঝেমাঝেই এই প্রসঙ্গ নানাসূত্রের সাথে একত্র হয়েছে।

বিভূতিভূষণ ইংরেজদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-প্রকল্প নির্মাণে 'ইংরেজ রাজনৈতিক-কৌশল' গ্রহণ করেননি। তিনি স্বাদেশিক বিষয়-আশয়ের মাধ্যমেই প্রতিরোধ-প্রকল্প দাঁড় করেছেন। বিশেষ করে টোটেমের বিষয়টি আদিম সমাজের সাথে সম্পৃক্ত, এবং একইসাথে টোটেম আদিম সময়ের জনগণের চিন্তা-প্রসূত বিষয় হিসাবেও বিবেচিত হয়। কিন্তু বিভূতিভূষণ এই বিষয়সমূহই ব্যবহার করেছেন উপনিবেশের বিরুদ্ধে, 'আধুনিক' সময়ে। অর্থাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *আরণ্যক* উপন্যাসে ভারতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ফলে–বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালুর পরে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল, তা তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। এবং এই বিষয়সমূহের সংশোধন এবং একটি সমাধান-প্রকল্প নির্মাণের জন্য কোনো উপনিবেশ প্রভাবিত কোনো নির্দিষ্ট কিংবা মূর্ত প্রতিরোধ-প্রকল্প নির্মাণ করার কোনো আগ্রহ বিভূতিভূষণের ছিল না। নিজ ভূমির বাস্তবতায় তিনি যেমন সমস্যাসমূহ খুঁজে বের করেছেন, তেমনি এই সমস্ত সমস্যার প্রতিরোধ-প্রকল্প নির্মাণের জন্যেও তিনি নিজ ভূমির বাস্তবতাকেই প্রতিরোধ-প্রকল্পের পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

উল্লেখপঞ্জি :

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (২০১৭)। 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু', *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

আনিসুজ্জামান (২০১৪)। *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)*। চারুলিপি, ঢাকা

ইরফান হাবিব (২০১৭)। *মধ্যযুগের ভারতে প্রযুক্তি : ৬৫০-১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ* [অনুবাদ : শুভাশিস ঘোষ]। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

এ. কে. নাজমুল করিম (২০১২)। *পরিবর্তনশীল সমাজ : ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ* [অনুবাদ : রংগলাল সেন, জিনাত হুদা অহিদ ও শিশির ঘোষ]। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

কার, ই. এইচ. (২০১৫)। *কাকে বলে ইতিহাস* [অনুবাদ : স্নেহোৎপল দত্ত ও সৌমিত্র পালিত]। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (২০১৬)। *বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

তীর্থংকর রায় (২০১৭)। *ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

দীপেশ চক্রবর্তী (২০১৫)। 'শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র : ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারি ও জনসংস্কৃতি'। *নিম্নবর্গের ইতিহাস* [সম্পা. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়], আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৯৭)। *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০১৭)। 'বন্ধন-ছেদন', *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯১)। *উপন্যাস রাজনৈতিক*। র‌্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯২)। *উপন্যাস রাজনৈতিক : বিভূতিভূষণ*। র‌্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

ফানো, ফ্রাঞ্জ (২০১৭)। *জগতের লাঞ্ছিত* [অনুবাদ : আমিনুল ইসলাম ভুইয়া]। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

বদরুদ্দীন উমর (২০১৯)। *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

বিনয় ঘোষ (২০১৬)। 'কলকাতার মন', *মেট্রোপলিটন মন, মধ্যবিত্ত*, বিদ্রোহ। প্রকাশ ভবন, কলকাতা

বিনয় ঘোষ (২০১৭)। 'জমিদার শ্রেণীর রূপান্তর'। *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ* [সম্পা. মুনতাসীর মামুন], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৭)। *আরণ্যক*। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

ব্লক, মার্ক (২০১৭)। *ইতিহাস লেখকের কাজ* [অনুবাদ : আশিস কুমার দাস]। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

ভীষ্মদেব চৌধুরী (২০২১)। *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৫৩)। *যোগাযোগ*। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৫৮)। *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ*। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা

রাজনারায়ণ বসু (১৭৯৬ শকাব্দ)। *সেকাল আর একাল*। বাল্মীক যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্তৃক মুদ্রিত, কলকাতা

রোমিলা থাপার (২০১৭)। *পুরাকাল ও পক্ষপাত* [অনুবাদ : অনুরাধা রায়]। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি

সাঈদ, এডোয়ার্ড ডব্লিউ. (২০১৯)। *সাম্রাজ্যবাদ ও সংস্কৃতি* [অনুবাদ : সামিউল হক]। হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম (২০১৭)। 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ও ফলাফল'। *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ* [সম্পা. মুনতাসীর মামুন), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সুপ্রকাশ রায় (২০১৭)। 'ভূমি-রাজস্বের "চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত" (১৭৯৩)'। *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ* [সম্পা. মুনতাসীর মামুন], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৩৯৪)। *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সৈয়দ আজিজুল হক (২০০৩)। *ময়মনসিংহ গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য*। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (2001). *The Philosophy of History* [Translator : J. Sibree. M.A]. Batoche Books, Kitchener, Ontario

Macaulay, T. Babington (2nd February, 1835). 'Minute on Indian Education'. Retrieved from : http://home.iitk.ac.in/~hcverma/Article/Macaulay-Minutes.pdf.

Madan, G. R. (1964). *Changing Pattern of Indian Villages*. S. Chand & Co., Delhi

Thapar, Romila (2016). 'Reflections on Nationalism and History'. *On Nationalism,* [Edited by Thapar, Romila, Noorani, A. G., Menon, Sadanand], Aleph Book Company, New Delhi